আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার সংহতিকালে দুর্বল দেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি

ড. সাজ্জাদ জহির

Daily Bonik Barta
April 28, 2021

কিছু স্বল্পোন্নত দেশের অভিজ্ঞতা এবং গত দুই দশকের বেশি সময় বিশ্বজুড়ে যা ঘটেছে, তার নিরিখে আমি সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির অঙ্গনে পরিলক্ষিত কিছু নিয়ম বা সম্পর্কের উল্লেখ করব। এগুলোকে ধ্রুব সত্য না ভেবে পর্যবেক্ষণ গণ্য করে কয়েকটি 'মন্তব্য' হিসেবে উল্লেখ করব। মন্তব্যগুলোকে যুক্তিপরম্পরায় গ্রথিত করে দুর্বল দেশগুলোর সংকটের উৎস ও স্বকীয়তা রক্ষার সম্ভাবনার প্রতি আলোকপাত করব। প্রতিটি মন্তব্যের ওপর মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যতের পৃথিবী সম্পর্কে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐকমত্য গড়ে তোলা এ নিবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে মনে করিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে অর্থনীতি থেকে ধার করা কিছু ধারণার ওপর নির্ভর করে গড়ে তোলা যুক্তিও একপেশে হতে পারে। বলতে দ্বিধা নেই যে আমাদের উপসংহারগুলো অনুমাননির্ভর এবং অনুমানগুলো অনেক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বেছে নেয়া হয়!

প্রথম মন্তব্য: অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাথমিক পুঁজি গঠন এবং সম্পদ বৃদ্ধির পেছনে অপকর্মের (সামাজিকভাবে 'অনৈতিক' অথবা বেআইনি কর্মকাণ্ডের) অবদান রয়েছে। তবে আজকের বিচারে যা অনৈতিক, তার কোনো কার্যপরিণতি আগামীতে সমাজে সমাদৃত হতে পারে। অর্থাৎ আজ যাকে দুর্নীতিবাজ ও লুটেরা মনে হচ্ছে, সে যদি তার উপার্জন দেশে বিনিয়োগ করে সমাজে উন্নতি ও স্থিতিশীলতা আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, তার অবদানকেই হয়তো আগামী দিনের মানুষ বেশি মনে রাখবে। তবে উল্লেখ্য, ব্যক্তিস্বার্থে লাঠিয়াল বাহিনী পোষা অথবা অনুদান দিয়ে ভক্ত ধরে রাখা একইভাবে সমাদৃত হবে না।

দ্বিতীয় মন্তব্য: পর্যাপ্ত যুক্তির অভাবে মূলধারা ভাবাদর্শে ও বিশ্লেষণে 'ষড়যন্ত্র তত্ত্বে'র তকমা লাগিয়ে অনেক সম্ভাব্য সংশয়কে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়। সম্ভবত এ-জাতীয় 'ষড়যন্ত্রে'র কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংশয়ভিত্তিক অনুসন্ধান শুরু করা সম্ভব নয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে সমাজবিজ্ঞানে বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণে মূল চালিকাশক্তি ('প্রাইম মুভার')-এর উপস্থিতি সর্বদা স্বীকৃত। অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কৌশলগত আচরণ ব্যাখ্যায় এবং চাণক্য নীতি নির্ধারণ পদ্ধতিতে মূল চালকের 'ষড়যন্ত্র' স্পষ্টতই স্বীকৃত।

[ব্যাখ্যা: আমাদের সহজাত ধারণাগুলো জনসমক্ষে ব্যক্ত করলে অনেক সময় তাতে ষড়যন্ত্রের গন্ধ খোঁজা হয়। গ্রহণযোগ্য বিকল্প ব্যাখ্যা না থাকলেও পর্যাপ্ত যুক্তি বা তথ্যের অভাবে সেসব সহজাত ধারণা 'প্রতিষ্ঠিত' বিজ্ঞজনেরা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নাম দিয়ে সংশয় উদ্ভূত বিশ্লেষণ প্রয়াসকে অংকুরে বিনষ্ট করেন। সাধারণত সমাজবিজ্ঞানে ভারসাম্যকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ কাঠামো সর্বজনস্বীকৃত। এটাও সাধারণভাবে স্বীকৃত যে সমাজে দৃশ্যমান ঘটনা (বা বাস্তবতা) এক বা একাধিক স্বার্থগোষ্ঠীর কর্ম ও চাওয়া-পাওয়াভিত্তিক দরকষাকষি বা একক কোনো গোষ্ঠীর চাপিয়ে দেয়া ফলাফল। অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকে অগণিত সরবরাহকারী ও ভোক্তার উপস্থিতিতে যে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের চিত্র দেখা যায় এবং যেখানে একক কোনো (মুখ্য) চালিকাশক্তি নেই, সেটা নিছকই পুস্তকে বেঁধে রাখা একটি আদর্শিক চিত্রায়ণ। বাস্তবে অপ্রতিযোগিতামূলক বাজার সর্বত্র বিরাজমান। সে বাজারে যে (স্বার্থগোষ্ঠী) প্রাধান্য বিস্তার করে, তারই ইচ্ছা-অনিচ্ছা বাজারের ফলাফল নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা রাখে। অনেক সময় আমরা নিম্নস্তরের ক্রীড়কদের (অর্থনীতির পরিভাষায়, এজেন্ট) যে সহজবোধ্য কাঠামোয় বিশ্লেষণ করি, সেসব বিশ্লেষণ কাঠামোয় উপরের স্তরের গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়ক বাদ পড়তে পারে। পাঠ্যপুস্তকে এ-জাতীয় দৃষ্টান্তকে মডেল স্পেসিফিকেশনের (নির্দিষ্টকরণ) অপর্যাপ্ততা (বা ত্রুটি) হিসেবে গণ্য করা হয়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ষড়যন্ত্র ও স্ট্র্যাটেজিক (কৌশলভিত্তিক) তত্ত্বে ফারাক থাকে না, উভয় ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার (তাদের) স্বার্থ চরিতার্থ করতে ফলাফল নির্ধারণে মুখ্য নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকে। তবে বিশ্লেষণ কাঠামোয় সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে একজন ক্রীড়ক (এজেন্ট) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারায় অনেক কার্যকর অনুমিতি ও বিশ্লেষণকে ষড়যন্ত্র তত্ত্বের তকমা লাগিয়ে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়।]

তৃতীয় মন্তব্য: সামাজিক সমগ্র বা সামগ্রিক সত্তা

একক সত্তার একাধিক পরিচিতি থাকতে পারে। তবে নির্দিষ্ট কোনো প্রেক্ষিতে ও সময়ে একাধিক সত্তার মধ্যে মেলবন্ধন তৈরি হয়ে একটি সামগ্রিক সত্তার প্রকাশ ঘটে। জৈবিক কোষের ক্ষেত্রে যেমনটি প্রযোজ্য, তেমনি এই সামাজিক সমগ্রতা নিজস্ব পরিচিতি লাভ করতে পারে, যা এর অঙ্গীভূত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয়কে সংজ্ঞায়িত করে। অনেক ক্ষেত্রেই এই 'সংগঠিত সমগ্র' ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠে অভ্যন্তরের বিবিধ গোষ্ঠীর মধ্যকার সামাজিক ফসল হিসেবে।

অনেক সময় তা বাইরে থেকে আরোপিত বলের (ফোর্স) বিপক্ষে প্রতিক্রিয়ার সম্মিলিত প্রকাশ হতে পারে এবং সে কারণে আর পাঁচটা প্রতিক্রিয়াধর্মী সামাজিক শক্তির মতো সহজেই চতুর বহিঃশক্তির কারসাজির শিকার হতে পারে। যেভাবেই গড়ে উঠুক না কেন, প্রতিটি সামাজিক সমগ্রের (সত্তা) অভ্যন্তরে নানা স্বার্থের সংঘাত থাকতে পারে এবং সেসবের মাঝে একটি মুখ্য চালিকাশক্তির উদ্ভব ঐতিহাসিকভাবে দৃষ্ট।

[উল্লেখ্য, একটি সামাজিক সমগ্র বহিঃশক্তির সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে তা বহুলাংশে নির্ভর করে সেই সমগ্রের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর ওপর। অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের ভেতরকার সম্পর্কের ওপর। শেষ উক্তির ওপর বাড়তি মন্তব্য করা যায়। কম কেন্দ্রীভূত সমাজেও দুর্নীতি প্রবণতা থাকে এবং সে ব্যবস্থায় সর্বস্তরে দুর্নীতি থাকায় (সংখ্যা) অনেকেই কিছু বাড়তি অর্জনের সুযোগ পায়। তবে অনেক স্টেশনে দাঁড়াতে গিয়ে ট্রেনের গতি যেমন শ্লথ হয়, তেমনি দুর্নীতির অর্থ সংগ্রহ বহু কেন্দ্রে বিভক্ত থাকলে অর্থনীতিক কর্মকাণ্ডের গতি হ্রাস পেতে বাধ্য। সেই তুলনায় বৈষম্যমূলক হলেও স্বৈরশাসনতুল্য কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় চুক্তি সম্পাদনের সময় ও অনিশ্চয়তা হ্রাস করে লেনদেন খরচ কমতে দেখা যায়, যা অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্রের প্রসারে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

দুর্নীতিগ্রস্ত হোক বা না হোক, স্বল্প বৈষম্যমূলক সমাজে ব্যক্তিপর্যায়ে বৃহদাকারে পুঁজি সঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তাই দেশপ্রেমী রাজনৈতিক নেতৃত্ব থাকলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সেই পুঁজি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা থাকে, যা পরবর্তী সময়ে কথিত সামাজিক সত্তা গড়ে তুলতে সহায়তা করে। ব্যাংকিং ও অর্থব্যবস্থার অন্যান্য খাত ব্যবহার করে ব্যক্তিপর্যায়ে পুঁজি গঠনের কার্যকর পদক্ষেপের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনায় যে পেশাদারিত্ব ও নৈতিক অটুটতা দরকার, তা দুর্বল দেশগুলোয় গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের পর দেখা যায় না।

নিঃসন্দেহে একজন স্বৈরশাসকের পক্ষে বৃহদাকারে পুঁজি গঠন, তা ব্যক্তির নামে হোক বা স্ব-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নামে হোক, অধিকতর সহজ। নির্বাচননির্ভর তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা'র চেয়ে আপেক্ষিকভাবে একটি একতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীনতা অধিকতর খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে সম্পদ দেশান্তর না হলে পুঁজি গঠনের সম্ভাবনার কারণে স্বৈরশাসনের আওতায় সামগ্রিক সত্তার প্রকাশ ঘটার সম্ভাবনা অধিক। একই সম্ভাবনা অবশ্য এর পতনেরও কারণ–অধিক শক্তিশালী হওয়ার ফলে স্থানীয় (স্বৈর) শাসকের সঙ্গে বহিঃশক্তি/স্বার্থের সংঘাতের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অঢেল। এক্ষেত্রে মসনদের বিরুদ্ধে সুবেদারদের বিদ্রোহ ও খাজনার ওপর অধিক ভাগ নিশ্চিত করতে স্বাধীনতা ঘোষণা উল্লেখ্য। অতীতে দৃষ্টি প্রসারিত করলে এটাও জানা যায় যে স্থানীয় মানুষ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করলে স্থানীয় শাসককে বহিঃশক্তির নানা ষড়যন্ত্রের কাছে অধিক নাজুক

হতে হয়। ‘গণতন্ত্র রক্ষা’, দুর্নীতি দমন বা সুশাসন প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে বঞ্চিত জনগণকে মদদ দিয়ে স্থানীয় সামগ্রিক সত্তার অস্তিত্বকে বিপন্ন করার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে কম নেই।]

চতুর্থ মন্তব্য: বিশ্বায়নের সঙ্গে দুর্নীতির যোগসূত্রতা

ব্যাংকিং খাত ও পুঁজিবাজারের কারসাজির জটিলতা এড়িয়ে মন্তব্যটি করছি। সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ থেকেই খাজনা আদায়ের সুযোগ তৈরি হয়। সে সম্পদের মালিক নিজে হওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জরুরি নয়। সরকার নিয়ন্ত্রিত সম্পদ বিক্রি বা লিজ দেয়ার সময় ‘সরকারি ভাণ্ডার’-কে বঞ্চিত করে যেমন ব্যক্তি লাভ সম্ভব, একইভাবে সম্পদ/দ্রব্য বা সেবা ক্রয় (প্রকিউরমেন্ট) কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে প্রশাসন ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বাড়তি আয়ের সুযোগ রয়েছে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় প্রসারিত রফতানি খাত যেমন লাভবান হয়, উন্মুক্ত ভোগ্যপণ্য আমদানির ফলে একই প্রক্রিয়া স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ব্যাহত করে। তবে বিশ্বায়নের ফলে উভয় রফতানি ও আমদানি (ও সেসবের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান) অধিকমাত্রায় জাতীয় আয়ের ভাগীদার হয়। এই বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আসে বিদেশী বিনিয়োগ, ঋণ প্রকল্প এবং বিশালাকারের ঠিকাদারিত্ব ও (ক্রয়/সংগ্রহ বা) প্রকিউরমেন্ট ব্যবসা। এসবই সরকারি প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকায় বিশ্বায়নের সঙ্গে ‘দুর্নীতি’র অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রতা রয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বায়নের ব্যাপ্তি বাড়লে দুর্নীতির সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়।

এক্ষেত্রে বাস্তব জগৎ থেকে নেয়া কয়েকটি বিষয়/সম্পর্ক লক্ষণীয়:

(ক) যখন কোনো দেশের সম্পদ আহরণে/ক্রয়ে ইচ্ছুক প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন সেই দেশের শাসকদের মাঝে দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়।

(খ) স্থানীয়দের বর্ধিত আর্থিক উপার্জন প্রায় ক্ষেত্রেই বিদেশের ব্যাংকে জমা হয় কিংবা দেশান্তরিত হয়ে তা বিদেশের সম্পদ হিসেবে প্রকাশ পায়। ফলে স্থানীয় সমাজে বৈষম্য অতটা তীব্রভাবে দৃশ্যমান না-ও হতে পারে। এতে ‘সমতার’ একটি মিথ্যা অভিপ্রকাশ দেখা যেতে পারে। দেশের অভ্যন্তরে ব্যয় না হলে আয়বৈষম্য দৃশ্যত হয় না, ফলে স্থানীয় সমাজে ক্ষোভ ও অস্থিরতা কম হতে পারে।

(গ) দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ পুঁজি গঠনে ব্যবহৃত হতে পারে। দেশের মধ্যে এ ধরনের সঞ্চয়ন যখন ঘটে, তখন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং নতুন অংশীদারিত্ব গড়ে ওঠে। তবে এটি একটি সমাজের ভেতরে সম্ভাব্য অনৈক্যও বাড়িয়ে দেয় এবং এ অসমতার মাত্রা ‘পাচারপ্রবণ’ ব্যবস্থার তুলনায় বেশি দৃশ্যমান হয়।

(ঘ) উল্লিখিত বাড়তি উপার্জন বা খাজনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণ করে সমাজের একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে যৌথ অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা সম্ভব। সেটা করলে বাইরের উসকানিতে যেকোনো দেশের অভ্যন্তরে বিভক্তি সৃষ্টি করা সহজ হয় না। কিন্তু দুর্বল দেশগুলোয় সে ধরনের ইতিবাচক দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায় না।

(ঙ) গত (২০২১-এর আগে) দুই দশকের অধিক কালজুড়ে ঘটমান রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয় যে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের নামে অনুদান বৃদ্ধি করে এক বিশাল কর্মবিমুখ জনগোষ্ঠী লালন করা হচ্ছে, যা রাজনীতিতে ঠিকাদারি সংস্কৃতি প্রবর্তন করেছে। যেহেতু রাজনৈতিক শাসকদের স্বদেশের মাটি আঁকড়ে থাকার বাসনা কম এবং শাসকশ্রেণীর অনেকেরই নাগরিকত্ব যেখানে প্রশ্নসাপেক্ষ, রাষ্ট্রীয় দেনায় লালিত কর্মিবাহিনীর প্রতি দীর্ঘকালীন সেই শাসকদের দায়বদ্ধতা আশা করা সমীচীন নয়। এসবের কারণে রাজনীতির অঙ্গনে অধিক পরনির্ভর, পরিশীলিত শিক্ষায় অদক্ষ এবং অপরিসীম ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদের মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যা সমাজ ও রাজনীতিতে অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করবে।

পঞ্চম মন্তব্য: একচেটিয়া ব্যবস্থায় বহুখণ্ডিত দুর্বল পক্ষ

বাজার বহুখণ্ডিত (সেগমেন্টেড) থাকলে প্রতিটি খণ্ডিত অংশে একচেটিয়া আধিপত্যের (লোকালাইজড মনোপলি) উদ্ভব ঘটার সম্ভাবনা থাকে। একই সঙ্গে লক্ষণীয় যে অপ্রতিযোগিতামূলক বাজার কাঠামোয় (ক্রেতা বা বিক্রেতার একচেটিয়া আধিপত্য যেখানে উপস্থিত) অধিক খণ্ডিত বাজারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

প্রসারিত ভাবনা: বিশ্বপরিসরে যদি একক কোনো সত্তা থাকে, যার চাওয়া-পাওয়া বিশ্ববাজার পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা রাখে, উল্লিখিত দ্বিতীয় মন্তব্য সত্য হলে দুর্বল দেশের সামগ্রিক সত্তার অস্তিত্ব সাময়িক, যদি না সেসব দেশে স্বাধিকার রক্ষায় বাড়তি উদ্যোগ নেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, প্রতিটি খণ্ডিত পরিসরে আধিপত্যের ভিত্তি উৎপাদন, না কি ঠিকাদারি, না খাজনা আদায়, তার ওপর রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নির্ভর করবে।

ষষ্ঠ মন্তব্য: চালকের ভূমিকায় অনবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিরল খনিজ সম্পদ দখলের লড়াই

আন্তর্জাতিক পরিসরে এমনকি কোনো কোনো দেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত ঘটনার পেছনে অনবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পদ দখলের লড়াই একটি বড় কারণ। কয়লা, গ্যাস বা তেল/পেট্রোলিয়ামের মতো অনবায়নযোগ্য জ্বালানির ভাণ্ডার এবং অন্যান্য বিরল খনিজ সম্পদ

দখল নেয়ার আকাঙ্ক্ষা ও তাদের সরবরাহ রুট নিয়ন্ত্রণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই সৃষ্ট হয় দেশে দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ, ভৌগোলিক সীমারেখা পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের।

[আগাম ভাবনা: আপনি যদি কোনো দুর্বল অথচ জ্বালানি সম্পদ ও বিরল খনিজে ভরপুর দেশের নাগরিক হন অথবা আপনার দেশের ওপর দিয়ে যদি সেসবের পরিবহন রুট থাকে তাহলে আন্তর্জাতিক পরিসরের এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার ধরন অনুধাবন জরুরি। দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে দেশ বিভাজন, বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশক জুড়ে ঔপনিবেশিকতাবিরোধী আন্দোলন ধারা, মধ্যপ্রাচ্যে সুদীর্ঘকাল ধরে চলা যুদ্ধ, সিরিয়া-ইরাক ও পাশের দেশের রাখাইনে সাধারণ মানুষের রাতারাতি শরণার্থীতে রূপান্তর–এসব ঘটনার প্রতি অন্ধ থাকা চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেবে। এর নেতিবাচক পরিণতি থেকে ভিন দেশের নাগরিকত্ব নেয়া ব্যক্তিরাও পরিত্রাণ পাবেন কিনা, সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে। নিজেদের ভবিষ্যৎকে সুস্থ রাখতে হলে দেশের অভ্যন্তরের ও বিদেশের বিভিন্ন খেলোয়াড়কে সঠিকভাবে চেনা প্রয়োজন এবং প্রতিটি নীতির সম্ভাব্য তাৎপর্য অনুধাবন ও সমাজের অটুটতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বৃহত্তর ঐক্য গড়ায় সচেষ্ট হতে হবে।]

সপ্তম মন্তব্য: দুর্বল দেশের সীমিত সম্ভাবনা

অর্থনীতিবিদদের মতো অনুমান করছি যে বাজারে দুই পক্ষ আছে। প্রথম পক্ষ (বাইরের শক্তি) যদি একক আধিপত্যবাদী হয়, বাজারের ফলাফল, অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষের প্রাপ্তি নির্ভর করবে দ্বিতীয় পক্ষ সেই বাজারে কী রূপ নিয়ে অবতীর্ণ হয়। যদি আদর্শিক গণতন্ত্রের লেবাসে সেই সমাজের প্রতিটি নাগরিক এককভাবে সেই বাজারে অংশগ্রহণ করে, অর্থনীতির বিশ্লেষণ বলবে যে দ্বিতীয় পক্ষ (যে দেশের নাগরিকরা গণতন্ত্র চর্চা করছে) বাজারের লেনদেন থেকে সামষ্টিকভাবে সবচেয়ে কম পাবে। অর্থনীতির পরিভাষায় এরা হবে অগণিত অসংগঠিত ভোক্তা (অথবা ক্রেতা), যারা নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় প্রথম পক্ষের চাপিয়ে দেয়া দাম ও শর্তাবলি মেনে চলবে।

প্রথম পক্ষের মতো দ্বিতীয় পক্ষকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যদি একক শাসক থাকে (অর্থাৎ সর্বময় ক্ষমতাধারী একজন), সেক্ষেত্রে অর্থনীতির পরিভাষায় বাজার ব্যবস্থাকে বলা হবে বাইল্যাটেরাল মনোপলি (দ্বৈত আধিপত্য)। এ ধরনের বাজারের ফলাফল দুই পক্ষের দরকষাকষির ওপর নির্ভর করবে। দ্বিতীয় পক্ষ সর্বোচ্চ লাভ যেমন করতে পারে, তেমনি প্রথম পক্ষের (আধিপত্য) চাপে পড়ে লেনদেনের আয় থেকে বঞ্চিত হতে পারে। এ কারণেই সম্ভবত এ-জাতীয় ব্যবস্থায় দ্বিতীয় পক্ষ হয় শক্তিশালী প্রতিপক্ষের (বহিঃশক্তি) কাছে দ্রুত নতি স্বীকার করে, অথবা অতি শক্তিশালী হিসেবে প্রকাশ পাওয়ায় প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। এ দুটোর ব্যতিক্রম আনতে হলে একক ক্ষমতাধারীকে নাগরিক সংযোগ স্থায়ী ভিত্তিতে দৃঢ় করা জরুরি।

শেষের শর্তটি পূরণ করতে হলে একদিকে যেমন নিজ সমাজের জন্য বাইরের সঙ্গে দরকষাকষি করতে হবে, তেমনি সেসব দরকষাকষি থেকে প্রাপ্তি সুষ্ঠু নীতিমালার মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে বিতরণ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। আগেই উল্লেখ করেছি যে এই বিতরণের বহু পথ রয়েছে, যেসবের পরিণতিও ভিন্ন। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সর্বক্ষেত্রে দক্ষ লোকের প্রয়োজন। স্বদেশ ও প্রবাসের উপযুক্ত মানবসম্পদকে জড়ো করে স্থায়ীভিত্তিক জোট গঠন ও তাদের মাঝে গণতন্ত্র চর্চা নিশ্চিত করা সম্ভবত তৃতীয় পথ, যা একদিকে বাইরের শক্তির সঙ্গে সম্মানজনক বিনিময়ে লিপ্ত হবে এবং একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সংযোগকে কর্মসংস্থান ও অন্যান্য আবশ্যিক চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে সুদৃঢ় করবে এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে এবং সুসংহত করতে উদ্যোগ নেবে।

[মূল নিবন্ধটি ২০০৭ সালে কম্বোডিয়ার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়েছিল। তাই সময়কাল সম্পর্কে অধিকাংশ উল্লেখ সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার অনুরোধ রইল। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে–নিবন্ধকার]

ড. সাজ্জাদ জহির: অর্থনীতিবিদ ও নির্বাহী পরিচালক

ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ (ইআরজি)

sajjadzohir@gmail.com